প্রবন্ধ সমগ্র

ডা. লুৎফর রহমান

প্রবন্ধ সমগ্র
ডা. লুৎফর রহমান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৯

গ্রন্থমালা সম্পাদক
সজল আহমেদ

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

পৃষ্ঠপোষকতা
সাইদরেজা তরুণ
(সাধারণ সম্পাদক) ডা. লুৎফর রহমান স্মৃতি পাঠাগার

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ৪৫০ টাকা

Probonda Somogra by Dr. Lutfar Rahman Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: August 2019 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 450 Taka RS 450 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-94239-1-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

প্রকাশকের কথা

মহৎ মানুষ তৈরির স্বপ্ন নিয়ে যে মানুষটি একদিন হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন, তিনি মানবতাবাদী সাহিত্যিক ডা. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান। তার সৃজনশীলতা বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধশীল। এক ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শ নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। যার অধিকাংশই মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি মানুষের মধ্যে জ্ঞানের তৃষ্ণা বাড়িয়ে তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করে যে জাগরণের চেষ্টা করেছেন তা সত্যি আজ বিরল ও গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২২ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'নারীতীর্থ'। অসহায় পতিতাদের সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি কাজ করে গেছেন। লুৎফর রহমানের জীবন ছিল দারিদ্র্য পীড়িত ও দুঃখময়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাসে তার এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ কোনো স্থান নেই। কিন্তু এই আধুনিক সমাজে আজও তিনি এবং তার 'নারীতীর্থ' সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাকে নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে। কারণ তার সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমরা জানতে পারিনি। এর সঙ্গে তার সাহিত্য সৃষ্টিরও ব্যাপক পঠন ও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

তার সমগ্র সাহিত্য রচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মহামূল্যবান সম্পদ হল প্রবন্ধের গ্রন্থসমূহ। এই প্রবন্ধের গ্রন্থগুলো একত্রে 'প্রবন্ধ সমগ্র' নামে প্রকাশিত করা হল।

বিনীত প্রকাশক
১ নভেম্বর ২০১৯

ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

আনিসুজ্জামান

যশোরের লুৎফর রহমানের (১৮৮৯-১৯৩৬) পেশা ছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, কিন্তু নেশা ছিল সাহিত্যে ও সমাজকর্মে। তিনি কবিতা ও উপন্যাস লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রবন্ধ রচনার মধ্যেই তাঁর প্রতিভা মুক্তি পেয়েছে। ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতায়, প্রকাশের কৌশল এবং চিন্তার মৌলিকতায় তাঁর প্রবন্ধাবলী বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সম্ভবত বৃহৎ ডন কুইকজোটের অনুবাদ। ১৯০৮ থেকে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা চল্লিশটি কবিতার সংগ্রহ 'প্রকাশ' (১৯১৫) তাঁর প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। ভূমিকায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁকে কাব্যক্ষেত্রে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু সিরাজীর সঙ্গে তাঁর চিন্তার মিল দেখি না। তাঁর কবিতাবলীর বিষয় সাধারণত প্রেম, মানবপ্রীতি ও নীতিবোধ। কতিপয় রচনা দুর্বল, তবে চার চরণের কয়েকটি ভাল কবিতাও এতে আছে। উনিশ শতকী নীতিকবিতা এবং রাবীন্দ্রিক গীতি-কবিতার ছাপ এসব রচনায় অল্পবিস্তর দেখা যায়। প্রথমটির উদাহরণ "স্বাধীনতা" কবিতাঃ

> অসত্য কলুষ যার হৃদয়ে না পশে
> অনুগ্রহ আশে কর পাতে না যে জন,
> বীর গরীয়ান সেই স্বাধীন পুরুষ
> প্রয়োজনে হাসিমুখে লভে সে মরণ।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ, "নাই", রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কবিতার স্মারক:

> কহিছে পরাণ কাঁদি-নাই, নাই, নাই,
> রৌদ্রদগ্ধ বৃক্ষভরা বিশ্বপানে চাই।
> যারে চাই এ ধরায় তারে পাই নাই,
> নীরস লোহায় বাঁধা জীবন কাটাই,
> কোথা তৃপ্তি, কোথা প্রেম, কোথা ভালবাসা?
> অসত্যের ঘর বাঁধি মিছামিছি হাসা।

লুৎফর রহমানের উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা দেখতে পাই তাঁর আদর্শবাদী মনের প্রকাশ। ব্যক্তির উন্নতি যেমন তাঁর আন্তরিক কামনা, সমাজ-

সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা তেমনি তাঁর প্রবল। উপন্যাস হিসেবে এগুলোর কোনটাই সার্থক হয় নি, তার কারণ তাঁর এই সামাজিক কল্যাণ-মূলক আদর্শ উপন্যাসে আরোপিত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কাহিনীর অগ্রগতি সাধনের পরিবর্তে এইসব উপন্যাসে তিনি ব্যক্তির সংকট এবং সামাজিক সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সরলায় (১৯১৭) একটি পথভ্রান্ত নারীর জীবন সমস্যা এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে তার প্রাণপণ সংগ্রাম বিকৃত হয়েছে। "এ উপন্যাসটিতেও চরিত্র-চিত্রণ নেই, আছে শুধু আদর্শ ব্যাখ্যানোপযোগী ঘটনার বর্ণনা"।[৩৬] পথহারায়[৩৭] চরিত্রসংখ্যা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেশি। বিভিন্ন চরিত্রের জীবনকাহিনী বর্ণনার সূত্রগুলো অসংলগ্ন। হিন্দু বিধবার দুরবস্থা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনাদর, হিন্দুর ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রভৃতির আলোচনা আছে। যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ পতিতাবৃত্তির প্রসারের কথা তিনি উল্লেখ করছেন এবং প্রকারান্তরে তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। রায়হানের (১৯১৯) আদর্শবাদী নায়কও তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা লেখকের বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। প্রীতি-উপহার (১৯২৭) "মেয়েদের জন্য" তাহাদের বধূ জীবনের মঙ্গলকামনায়" রচিত হয়। স্ত্রীকে বইটি উৎসর্গ করে তিনি বলেছেন, "প্রার্থনা করি অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করিয়া বাহিরের ভাষা আর বেদনার বাণী তাহার চিত্তে ধ্বনি লাভ করুক।" তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

বাঙালি মুসলমান পরিবারকে উচ্চচিন্তা এবং উন্নত জীবন ধারার সঙ্গে পরিচিত করান, পরিবারে শান্তি, সুখ এবং ধর্ম্মভাব জাগ্রত করানই, আমার এই ধরনের পুস্তক লিখিবার একমাত্র উদ্দেশ্য।

চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা হালিমার বিবাহ স্থির হয়েছে, সেই উপলক্ষে তার ভাবী কুলসুম সাংসারিক জীবন সম্পর্কে নানারকম উপদেশ দিচ্ছেন। এই কথোপকথন উপন্যাসের আধিকাংশ স্থান নিয়েছে। দু-তিনটি অধ্যায়ে অন্যান্য চরিত্র দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত বিদেশী পণ্যবর্জনের সমর্থন আছে। 'বাসর-উপহার' নামে তাঁর আরো একটি উপন্যাস আছে।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূরণ হয়েছে। মানবজীবন (১৯৩৬) ও উন্নত জীবন তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আশ্চর্য সারল্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেছেন। তাঁর প্রবন্ধমাত্রই ভাবাশ্রিত রচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আদলে গড়া। এই অনায়াস কথনভঙ্গী, অল্পকথায় অধিক বলা তাঁর বিশেষ রীতি। মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেবল এয়াকুব আলী চৌধুরী ও বেগম রোকেয়া এক্ষেত্রে তাঁর তুল্য। তাঁর চিন্তার ও প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকতা নিম্নোক্ত উদ্বৃতিসমূহে প্রতীয়মান হবে।

মানবজীবনের "আল্লাহ" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব। "সুন্দর, কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন। ....তিনি

আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে।" এই উপলব্ধি থেকে "স্বভাবগঠন" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

খোদার জন্য যে তর্ক করে, তার মূল্য খুব কম। এসলাম শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলবার জন্যে যে মহা আস্ফালন করে, তারও মূল্য কম। যে মিথ্যা পরিহার করে, আপন স্বভাব গঠন করে, সেই প্রকৃত খোদা-ভক্ত, সেই পরম শান্তিতে আছে, সেই মুসলমান। মুসলমানের অর্থ তর্ক নয়, আস্ফালন নয়, এর অর্থ নীরবে নিজেকে গঠন করে তোলা। এসলাম মানে কাজ-বাক্য নয়।

অনুরূপ মাপকাঠিতে তিনি ইসলামের বর্তমান অবস্থার পুনর্বিচার করতে চেয়েছেন, বৃথা ঐতিহ্য গর্বে আন্দোলিত হয়নি। "প্রেম" প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

খ্রিষ্টান ধর্ম আজ এত সমুজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে ইসলাম ধর্মের প্রভাবের ফলে। আল্লাহর মঙ্গল বাণী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন, তার ফলে ইঞ্জিল কেতাবে দীপ্তি ইউরোপবাসীর চোখে সমুজ্জল হয়ে প্রতিভাত হয়েছে। (সত্যের মর্যাদার জন্য একথাও বলতে হবে, আজ খ্রিষ্টান জাতি এবং তাদের culture ইসলামের সৌন্দর্য্য নূতন করে অনুভব করতে আমাদিগকে সাহায্য করেছে। কার কতখানি কৃতিত্ব ...মানুষের মনুষ্যত্ব প্রেম, বিনয়, তার নিজস্ব মূল কি, তাই দেখতে হবে।)

স্যার সৈয়দ যেমন ইউরোপীয় সভ্যতার মাহাত্ম্য স্বীকার করেছিলেন, পরে কিন্তু তেমনি আবার ইউরোপীয় সভ্যতার চাইতে ইসলামকে বড় বলে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চলেছিল হালীর কাব্যে, আমীর আলীর প্রবন্ধেও নোমানীর গবেষণায়। সমকালে ইকবালও ইউরোপের সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। লুৎফর রহমান কিন্তু ইউরোপের মানবতাবাদের মূল্য নির্ণয়ে ভুল করেননি, তবে সেটাকে খ্রিষ্টান আদর্শ বলে আখ্যাত করা তাঁর সঙ্গত হয়নি।

আমাদের আচরিত ধর্ম জীবনকেও তিনি সমালোচনা করেছেন "সেবা" প্রবন্ধে ঃ

সাধু ও মারফত-পন্থী বুজর্গ বল্লে আমরা বুঝি তিনি দিবারাত্র ঘরের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ্ করেন-দোওয়া পড়ে রোগীকে রোগমুক্ত করেন। বুজর্গের ইহাই ভাব নয়। ইহা ধর্মহীন লোকের চালাকী। সেবক শুধু দরুদ পড়েন না, সেবাকার্যের প্রয়োজন হলে প্রাণ দেন। সেবায় তাঁর কোন অহঙ্কার নেই।

খ্রিস্টান মিশনারীদের আর্তসেবা এখানে হয়তো তাঁর মনে পড়েছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি সক্রিয় হয়েছে তাঁর এই ধারণা যে, মানুষের মধ্যেই স্রষ্টা আছেন। এবং সকল ধর্মে স্রষ্টার কাছে প্রণতি জানাবার যে রীতি আছে তার সার্থকতম উপায় মানবহিতৈষণায় পাওয়া যাবে।

উন্নত জীবনেও এই মানবপ্রীতির অভিব্যক্তি প্রথম ও প্রধান কথা। তিনি বলেছেন :

কোন জাতিকে যদি বলা হয়-তোমরা বড় হও, তোমরা জাগ, তাতে ভাল কাজ হয় বলে মনে হয় না-এক একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি। পল্লীর অজ্ঞাত অবজ্ঞাত এক একটা মানুষের কথা ভাবতে হবে।

মানুষের উন্নতির জন্য তিনি বলেছেন- প্রয়োজন তার চিত্তে জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগানো, মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন করা, তার চলার পথ নির্বিঘ্ন করা। অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, সাধনা, চরিত্রশক্তি ও আদর্শ প্রভৃতি সদগুণের মূল্য উপলব্ধি করে, জীবনে এসবের চর্চা করলে মানুষ বড় হবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিকতার মূল্য তিনি কখনোই স্বীকার করেননি :

> জ্ঞান, চরিত্র, মনুষ্যত্ব ও কর্ম্ম ছাড়া যদি আধ্যাত্মিকতা স্বতন্ত্র জিনিষ হয় তবে সে আধ্যাত্মিকতায় কোন কাজ সেই।

সত্য ও কর্মের আদর্শ প্রতিপালন করতেন বলে মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বিশেষ করে, তাঁরা যে নারীর সম্মান দিতে জানতেন, সে-কথা লুৎফর রহমান বারবার মনে করেছেন। উপন্যাসের মাধ্যমেই নারীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা তিনি করেন নি, *নারীশক্তি* বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ এবং *নারীতীর্থ* নামে একটি আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সত্য ও কর্মের পথে নিজে অগ্রসর হয়েই তিনি অন্যকে আহ্বান করেছিলেন। *মহৎ জীবনে* ও *সত্য জীবনে*ও এই আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন ও সংকীর্ণতার বন্ধনে আবদ্ধ দেশবাসীকে এই পথে ডাক দিয়ে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তার তুলনা বিরল।

কিশোরদের উপযোগী তাঁর অন্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম : *ছেলেদের মহত্ব কথা*, *ছেলেদের কারবালা* ও *রানী হেলেন*।

সূচিপত্র

মানব জীবন ১৩
মহৎ জীবন ৫৭
উন্নত জীবন ১০৯
উচ্চ জীবন ১৫৯
ধর্ম জীবন ২২১
মহা জীবন ২৫৭
যুবক জীবন ২৯৭

পরিশিষ্টি-১
ডা. লুৎফর রহমান সাহেবের স্মৃতি : গোলাম মোস্তফা ৩৪১
পরিশিষ্টি-২
'নারীতীর্থে'র লুৎফর রহমান : খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন ৩৪৪
পরিশিষ্ট-৩
মোহাম্মদ লুৎফর রহমান-এর জীবনপঞ্জি ৩৪৯

মানব জীবন

সূচি

মানব-চিত্তের তৃপ্তি ১৫
আল্লাহ্ ১৬
শয়তান ১৭
দৈনন্দিন জীবন ২০
সংস্কার মানুষের অন্তরে ২৩
জীবনের মহত্ত্ব ২৮
স্বভাব-গঠন ৩৩
জীবনের সাধনা ৩৬
বিবেকের বাণী ৪২
মিথ্যাচার ৪৪
পরিবার ৪৬
প্রেম ৪৮
সেবা ৫১
এবাদত ৫৪

মানব-চিত্তের তৃপ্তি

মানব-চিত্তের তৃপ্তি অর্থ, প্রাধান্য, ক্ষমতা এবং রাজ্যলাভে নেই। আলেকজান্ডার সমস্ত জগৎ জয় করেও শান্তি লাভ করেননি। মানুষ অর্থের পেছনে ছুটেছে- অপরিমিত অর্থ দাও তাকে, সে আরও চাবে। তার মনে হয় আরও পেলে সুখী হবে। সমস্ত জগৎ তাকে দাও, তবুও সে সুখী হবে না। জাগতিকভাবে যারা অন্ধ, তারাই জীবনে সুখ এইভাবে খোঁজে। দরিদ্র যে, সে আমার জীবন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে ঈর্ষা করছে, সে আমার অবস্থার দিকে কত উৎসুকনেত্রে তাকিয়ে থাকে,-কিন্তু আমি নিজে কত অসুখী। পরম সত্যের সন্ধান যারা পায়নি, মানব-হৃদয়ের ধর্ম কী, তা যারা বুঝতে পারেনি—তারাই এইভাবে জ্বলে-পুড়ে মরে, এমনকি এই শ্রেণীর লোক যতই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে থাকে, ততই এদের জীবনের জ্বালা বাড়ে। প্রতিহিংসা-বৃত্তি, বিবাদ, অর্থ-লোভ আরও তীব্রভাবে তাদের মত্ত ও মুগ্ধ করে। তখনও তারা যথার্থ কল্যাণের পথ কী, তা অনুভব করতে পারে না। জীবন ভরে যেমন করে সুখের সন্ধানে এরা ছুটেছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও তেমনি তারা সুখের সন্ধান করে,—পায় না, এই পথে মানুষ সুখ পাবে না। ক্রোধে তারা চিৎকার করে, মানুষকে তারা দংশন করে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের দুঃখী, আহত-ব্যথিত মন নিজের দেহ এবং পরের অন্তরকে বিষাক্ত করে। বলতে কি, মানুষ জাগতিক কোনো সাধনায় সুখ, আনন্দ এবং তৃপ্তি পাবে না। এই পথ থেকে মানুষকে ফিরতে বলি; সমস্ত মহাপুরুষই এই কথা বলেছেন। মানুষ তার জীবনকে অনুভব করতে পারেনি; শয়তান মানুষ-চিত্তকে ধর্মের নামে ভ্রমান্ধ করেছে।

সত্যের সাধনাই মানব-হৃদয়ের চরম ও পরম সাধনা। পরম সত্যকে দিনে দিনে জীবনের প্রতি কাজের ভেতর দিয়ে অনুভব করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা। কত বিচিত্রভাবে তাকে অনুভব করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। যিনি যতটুকু এই পরম সত্যকে অনুভব করতে পেরেছেন, তিনি তত বড় সাধক, সন্ন্যাসী এবং ফকির। জগতে যা কিছু কর, যত কাজেই যোগ দাও, পরিবার প্রতিপালন কর, শিশুর মুখে চুম্বন দাও—মানব-চিত্তের এই একমাত্র গুরুতর সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সত্যময় আল্লাহ্তায়ালাকে হৃদয়ে ধারণ করা, তাতে মিশে যাওয়া, আল্লাহ্ময় হয়ে যাওয়া—সর্বপ্রকারের সত্য, সুন্দর, মধুর ও পূর্ণ হয়ে ওঠা—এই-ই চরম ইবাদত।

আত্মার এই সিদ্ধির জন্যই ধর্মের যাবতীয় বিধি-বন্ধন। শুধু বিধি-বন্ধনে মত্ত থাকলে এবং তাকেই চরম মনে করলে মানবাত্মা বিনষ্ট হবেই। হাজার নিয়ম পালন ও রোজা-উপাসনায় তাকে উন্নত ও উজ্জ্বল করতে পারবে না। জীবনকে আল্লাহ্র রঙে রঙিন করে তুলতে হবে, সমস্ত চিন্তা, কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে সেই সত্য, সুন্দর ও সুমহানের গুণকে প্রকাশ করতে হবে।

আল্লাহ্

বহুদিন আগে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আল্লাহ্ কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ অনন্ত—তাঁকে কেউ জানে না।'

'আল্লাহ্'র এই ব্যাখ্যা মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও আশার কথা নহে। 'আল্লাহ্ অনন্ত' শুনে আমাদের মন বিন্দুমাত্র বিচলিত ও চঞ্চল হয় না। এই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাই নয়। বস্তুত আরও অনেকে আল্লাহ্র ব্যাখ্যা অনেক কথায় দিয়ে থাকেন, তাতে আল্লাহ্র পরিচয় মানুষ একটুও পায় না—মানুষ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

এই জগৎ, এই অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত জীবনের উৎস যিনি আছেন এবং থাকবেন—যিনি চিরসত্য, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি আমাতে আছেন, যিনি আমাকে ভালোবাসেন, প্রেম করেন, আমার সঙ্গে খেলা করেন, পথে পথে ঘুরে বেড়ান, আকাশে যাঁর বাঁশি বাজে, হাম্বারবে যাঁর অফুরন্ত প্রেম উছলে উঠে, যিনি মাতৃহারা শিশুর আর্তকণ্ঠে বিশ্বকে মা বলে ডাকেন—আমি তাঁকে দেখতে চাই, পেতে চাই, হৃদয়ে ধারণ করতে চাই। ঝড়ের দোলায় তাঁর ভীষণ হাস্য বাজে, বজ্রনিনাদে তাঁর শঙ্কা ধ্বনিত হয়।—অনন্ত সৃষ্টি তিনি বুকে ধারণ করে আছেন, তিনি নর-নারীর অঙ্গশ্রীতে লীলায়িত হন, গানের সুরে তিনি ক্রন্দন করেন—সেই অশ্রুর দেবতাকে আমি দেখতে চাই-অনন্ত আকাশে, নিথর রাতে তাঁর ক্রন্দন শুনেছি, মুগ্ধ নির্জন প্রান্তরে তাঁর শোক বাতাসে বয়ে এনেছে, তাঁকে পাবার জন্য মানব-চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ছুটছে। আমি তাঁকে পেতে চাই, তাঁকে চুম্বন করতে চাই। মানব-চিত্তের চির-প্রেয়সীর অঞ্চল ধরে অনন্ত সোহাগে আমি বাসরের আনন্দ অনুভব করতে চাই।

আল্লাহ্' কী? তাঁর কোনো সিংহাসন নেই, কোনো আসন নেই, রূপ নেই-অন্তরের সঙ্গে তিনি মিশে আছেন। সুন্দর, কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন। তোষামোদে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে! তিনি রূপমুক্ত প্রেম, কল্যাণ এবং জীবন্ত সত্য। মনুষ্য যখন অন্যায়ভাবে আঘাত পেয়ে আঘাতকারীকে আশীর্বাদ করেছে, তখনই আমি তাঁর রূপ দেখেছি। অসত্য ও অন্যায় দেখে মনুষ্য যখন লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছে, তখনই আমি তাঁর রূপ দেখেছি। মনুষ্য যখন মনুষ্যের জন্য আঁখিজল ফেলেছে, তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। জননী যখন শিশুকে বুকে ধরেছেন, তখনই আমি তাঁকে দেখেছি। বন্য পশু যখন সন্তানের স্নেহে ব্যাকুল অস্থির হয়ে গর্জে ছুটেছে, তখনই সেই রূপহীনকে আমি চোখের জলে দেখেছি। হে রূপহীন! তুমি ধন্য!—তোমার এত রূপ, কে বলে তোমার রূপ নেই? এতভাবে মনুষ্যকে তুমি ধরা দিচ্ছ—তবুও দেখলাম, তোমার রূপ সমস্ত গগন-পবনে ছড়িয়ে আছে, সমস্ত অবুঝ মনুষ্য বলে—তোমাকে দেখিনি। প্রাতঃকালে যখন উঠলাম, তখন প্রকৃতিতে তোমার পায়ের নির্মল সুরভি লেগে আছে, সমস্ত দিন ভরে নিজেকে প্রকাশ করলে, তবু বলি তোমায় রূপহীন।

শয়তান

প্রভু! বীভৎস, ঘৃণিত, কুৎসিত মুখ আমি দেখতে চাই। আমার হাত তুমি ধরো, আমি শয়তানের মুখ দেখব—খুব ভালো করে তাকে দেখব। শয়তান কেমন করে আমাকে মুগ্ধ করে, আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে, আমাকে উদভ্রান্ত করে, আমাকে তোমার স্নেহ-মধুর পূত-নির্মল সহবাস হতে ইঙ্গিতে বিভ্রান্ত করে।

সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণা করতে চাই। তাকে দেখিনি বললে চলবে না। তার ঘৃণিত, পৈশাচিক মুখ আমায় দেখাও, আমার দেহের অণুপরমাণু ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে উঠুক, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি শয়তানকে ঘৃণা করতে চাই।

আমি অনেক সাধনা করেছি, অনেক রাত্রি তোমার ধ্যানে কাটিয়েছি—আমার সমস্ত শরীর তোমার পরশ-পুলকে অবশ হয়ে উঠেছে; আমাতে আমি নেই—আমার নয়ন দিয়ে তোমার প্রেমের অশ্রু ঝরেছে। পৃথিবীর সমস্ত আবিলতা মুক্ত হয়ে তোমার প্রেমে ধন্য হয়েছি; অকস্মাৎ চোখের নিমেষে শয়তান এসে আমার সর্বনাশ করে গেল,-আমাকে এক মুহূর্তে, পাতালের গভীরতম কূপে ফেলে গেল, ক্ষণিকের লোভে মানুষের মাথায় বজ্রাঘাত করলাম, অন্ধকার নিশীথে পশুর নেশায় বারবনিতার সৌন্দর্য-শ্রীতে ডুবে মরলাম, গোপনে লোকচক্ষুর অগোচরে কুকার্যে আসক্ত হলাম, মানুষের বুদ্ধি-অনুভূতির অন্তরালে প্রতারণায় আত্মনিয়োগ করলাম। প্রভু, কে আমায় রক্ষা করবে? মানুষ আমার পাপ দেখেনি, আমি একাকী দেখেছি, আমাকে,—শয়তান আমার সর্বনাশ করেছে। প্রভু, মানুষের অগোচরে আমায় দুর্জয় করো; শয়তানের কুৎসিত মুখশ্রী আমায় দেখাও।

পৃথিবীর যত পাপ—পৃথিবীর যত প্রতারণা, নীচাশয়তা, হীনতা, কাপুরুষতা তাই তো শয়তানের মুখ। সাধু-সঙ্গ ত্যাগ করে শয়তানের মুখ ভালো করে দেখবার জন্য, পৃথিবীর সমস্ত কাপুরুষতা, সমস্ত মূঢ়তা, গোপন পাপ, নারীর ব্যভিচার আজ আমি ভালো করে দেখতে চাই।

একটা দরিদ্র লোক জীবনভর কিছু টাকা উপায় করেছিল। একদিন এক নামাজিকে তার বাড়িতে গিয়ে গভীর রাত্রে পঞ্চাশটি টাকা হাওলাত করে আনতে দেখেছিলাম। নামাজি বিয়ে করতে যাচ্ছিল, খুব বিপদে পড়েই তাকে সেখানে টাকার জন্য যেতে হয়েছিল। পঞ্চাশটি টাকা সে চাওয়া মাত্র পেয়েছিল—কোনো সাক্ষী ছিল না, কোনো লেখাপড়া দলিলপত্র হয়নি। এই ঘটনা দেখেছিলেন শুধু আল্লাহ্ আর নামাজির অন্তর-মানুষ। তারপর দশ বছর অতীত হয়ে গেছে। লোকটি মারা গেছে। তার বিধবা পত্নী নামাজির বাড়িতে হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে এখন আর হাঁটে না। এই ব্যক্তিকে লোকে মুসলমান বলে, মানুষ তাকে ঘৃণা করে। তাকে অমানুষ বলে ধরবার কোনো পথ নেই। সে পাঁচটি ফরজই আদায় করেছে। কে তাকে কাফের বলবে? কিন্তু আমি দেখেছি তার মুখে শয়তানের বিশ্রী মুখ।

একজন কেরানি তার পত্নীকে খুব ভালোবাসত। সারা দিন সে পোস্ট অফিসে গাধার খাটুনি খাটত, আর তারই মাঝে তার পত্নীর মুখখানি বুকে জেগে উঠত। মাতাল যেমন মদ খেয়ে দুর্বল দেহটিকে সবল করে নেয়, সেও তার দুর্বল দেহটাকে পত্নীর মুখখানির কথা মনে করে সবল শক্ত করে নিত। পোস্ট অফিসের ভারী ব্যাগগুলো ধাক্কা মেরে সে দশ হাত দূরে ফেলে দিত।

সে যখন বাসায় ফিরতো, বাজার থেকে এক গোছা গলদা চিংড়ি মাছ কিনে শিস দিতে দিতে বাড়ি আসত, পত্নীর হাতে সেগুলি দিয়ে প্রেমে তার মুখের পানে চেয়ে থাকত।

এক ছোঁকরা ওই বাড়িতে আসত। কেরানি তাকে পুত্রের মতো স্নেহ করত। তার বয়স আঠারো বছর হবে। একদিন ছোঁকরার সঙ্গে ঘরখানি খালি করে পত্নীটি চলে এসেছিল—সে এখন পতিতা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

একদিন বাড়িতে ঝগড়া করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখলাম—সেই পতিতার উজ্জ্বল দীপ্ত লোহিত মুখ। সেই মুখে দেখেছিলাম শয়তানের কুৎসিত মুখ—বীভৎস দৃষ্টি। হৃৎপিণ্ডে আগুন জ্বলে উঠেছিল, আন্তরিক ঘৃণায় সেই স্থান ত্যাগ করলাম। আমার পাপচিত্ত ক্রুদ্ধ ঘৃণায় জ্বলে উঠেছিল। মহাপাপের মুখ দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম।

শয়তান! আমি তোমার মুখ আরও ভালো করে দেখতে চাই—প্রভুকে যেমন করে দেখছি, তোমাকেও তেমন করে দেখতে চাই, অনন্তভাবে আমি তোমার ঘৃণিত কুৎসিত নগ্ন ছবি দেখতে চাই। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ঘৃণা করতে চাই। ভালো করে তোমার মুখ আমায় দেখাও, আমি দুই হাত দিয়ে ভালো করে স্পর্শ করে তোমায় দেখতে চাই।

শমশের এবং হাসান দুই ব্যক্তি কথা বলছিলেন। শমশের বললেন, আপনি মহামানুষ, দেশসেবক, আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

হাসান—জনাব, জীবন অনিত্য, কোন সময় যাই, তার ঠিক নাই, আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার দরকার নেই।

শমশের বললেন, আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ, আপনি মহামানুষ।

অতঃপর হাসান সে স্থান থেকে চলে গেলেন। তাঁর স্থান ত্যাগ করা মাত্র শমশের বললেন, 'এই ব্যক্তিকে আমি চিনি—ভারি শয়তান।' শমশেরের মুখে দেখলাম, কাপুরুষ নিন্দাকারী শয়তানের বীভৎস ছবি। শয়তানের হাত থেকে রক্ষা চাই। আমাদের এই সুপবিত্র মুখশ্রীতে শয়তানের মুখ ফুটে না উঠুক।

একজন বন্ধু আর একজন বন্ধুকে ভালোবাসত। প্রথম বন্ধুটির গৃহে দ্বিতীয় বন্ধুটি প্রায়ই যেত। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত। একদিন দেখলাম দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুর অনুপস্থিতিতে প্রথম বন্ধুর পত্নীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমালাপে মত্ত। শয়তানের মুখ দেখতে বাকি রইল না। শয়তানকে ভালো করেই চোখের সামনে দেখলাম।

একটি যুবক, সে বক্তৃতা করত, এক সংবাদ-পত্রিকার সম্পাদক সে। এক বুড়ির বাড়িতে সে যেত। বুড়ি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, স্নেহ করত; এতটুকু অবিশ্বাস করত না। বুড়ি উচ্চ-হৃদয় যুবককে গৃহে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করত। বুড়ির একটি মাত্র অবলম্বন ছিল তার ১২ বছরের প্রিয় সন্তানটি, দেখতে বেহেশতের পরী-বালকের মতো। এই যুবক বালকটিকে ভালোবাসত; বুড়ি প্রাণ ভরে দেখত তার পিতৃহীন সন্তানকে যুবক ভালোবাসে, স্নেহ করে। প্রাণভরে সে যুবককে আশীর্বাদ করত। একদিন যুবক এই শিশুর পবিত্র মুখে গোপনে চুম্বন করল। সুকুমার স্বর্গের শিশুটি যুবকের মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে শিশুকে যুবক পাপের পথে আকর্ষণ করল। তার সোনার হৃদয়-কুসুমে পাপের হলাহল ঢেলে দিল। বুড়ির নয়ন-পুত্তলির সর্বনাশ হয়ে গেল। বুড়ি তা জানতে পারল না। তার সাজানো বাগানে যুবক আগুন ধরিয়ে দিল। এখন দেখি বুড়ি অন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় সে ভিক্ষা করে। তার সোনার যাদুটি মারা গেছে। শিশুটি ধীরে ধীরে পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে, তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বিবিধ রোগে সে ভেঙে পড়ে, সে মদ, গাঁজা, ভাঙ খায়, পরে সে জেলে যায়, সেখানেই মরে। সেই সম্পাদক যুবককে কেউ জানে না, তাকে মানুষ নমস্কার করে। নিকটে এলে আসন এগিয়ে দেয়। অনেক টাকা তার। আমি তার মুখ দেখলে ভয় পাই। সম্মুখে সাক্ষাৎ শয়তান দেখে শিউরে উঠি।

এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে তার সেয়ানা মেয়েটি থাকত। মেয়েটির স্বামী বিদেশে থাকে। ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ও থাকত। দেখলাম, একদিন সেই আদরের মেয়েটি সেই যুবকটির সঙ্গে গোপনে গোপনে আলাপ করছে। মেয়েটির মা-বোনেরা তা জানে, জাতি যাবার ভয়ে কোনো কথা বলে না। নির্জন কক্ষে এই দু'টি বিশ্বাসঘাতক নর-নারী কথা বলে, একসঙ্গে খায়।

যুবকটি ভয় করে, অনিচ্ছা প্রকাশ করে; বিবাহিতা অবিশ্বাসিনী যুবতীটি তাকে বলে, কোনো ভয় নেই।

দুই বছর পরে দেখলাম, এক জায়গায় এক বাবুর গৃহিণীরূপে এই বালিকাটিকে। বাবু পরম বিশ্বাসে পত্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছেন, পত্নীও স্বামীর সঙ্গে আনন্দে কথা বলছে।

এই দৃশ্য দেখে শোকে আমার চোখ জলে ভরে উঠল। শয়তানের এই অভূতপূর্ব কীর্তির ছবি চোখ দিয়ে দেখলাম। অসহ্য দুঃখে ভাবলাম, মানুষের অত্যাচার এবং মূর্খতা!—অবিচার আর শয়তানের প্রাণঘাতী কীর্তি!

এক মহাজন এক ব্যক্তিকে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। লোকটি একদিন মহাজনের সর্বনাশ করার জন্য চালাকি করে ঘরে সিঁদ কেটে দুপুর রাতে কাঁদতে আরম্ভ করল। লোকজন যখন জমা হলো, সে কেঁদে বলল, 'তার সর্বনাশ হয়েছে, চোর তাকে সর্বস্বান্ত করে গেছে, কী করে সে মহাজনকে মুখ দেখাবে?'

প্রাতঃকালে সে মহাজনকে টেলিগ্রাম করল। থানার কর্মচারীর সঙ্গে রাতে গোপনে সে দেখা করল। চুরি যে ঠিক হয়েছে এবং সে যে নিঃস্ব হয়ে গেছে, তা প্রমাণ হয়ে গেল। তার মিছে সর্বনাশের কেউ প্রতিবাদ করল না। করতে কেউ সাহস পেল না।

এই নিমক-হারাম বিশ্বাসঘাতক লোকটি সেই টাকা নিয়ে এসে বাটীতে মসজিদ-ঘর তুলল। সেই ঘরে বসে সে বন্দেগি করে। মানুষের মুখে তার প্রশংসা ধরে না; কত মানুষ তার গৌরব করে, কত মৌলবীর মুরব্বি সে, কত ভদ্রলোকের বন্ধু সে। আমি তার মুখ দেখলেই ভয় পাই, তার মুখে কার বীভৎস মুখ দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠি। ঘৃণায় সে স্থান ত্যাগ করি।

চল্লিশ বছর পূর্বে এক ব্যক্তি রেঙ্গুনে গিয়েছিল; সেখানে গিয়ে সে একটি বালিকাকে বিবাহ করেছিল। সেই বালিকাটি এখন যুবতী। যৌবনের রূপ-ঐশ্বর্য দেখে তাকে ভোগ করার লোভ সংবরণ করতে না পেরে, সে প্রতারণা করে তাকে বিয়ে করেছিল।' যখন তার পিপাসা মিটে গেল। তখন একদিন 'আসি' বলে ওই যে পালিয়ে এল, আর কোনোদিন সেখানে গেল না। সেই বালিকা যে কত বছর ধরে পথের পানে তার প্রিয়তমের আশায় চেয়েছিল, তা কে জানে? এই যুবক একজন ধার্মিক ভদ্রলোক। সমস্ত ধর্ম সাধনাই তার ব্যর্থ হয়েছে। প্রভু আর আমি জেনেছি সে কে!

এক ব্যক্তি মরে গেছে। সে যে বিপুল সম্পত্তি রেখে গেছে তার জন্য তার বংশের মর্যাদা দেশজোড়া। সে ছিল এক জমিদারের নায়েব। জমিদার বিশ্বাস করে তার সম্পত্তি নায়েবের হাতে দিয়ে আনন্দ করে বেড়াত। ধীরে ধীরে জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে বিশ্বাসঘাতক নায়েব নিজেই জমিদার হলো। তার এখন কত সম্মান, মানুষ তার নামে দোহাই দেয়, কত ইট-পাথর তার বাড়িতে। কত বড় বড় প্রতিমা তার ঘরে ওঠে। আমি তার বাড়ির সামনে গেলেই হাসি—শয়তানের ভণ্ডামি দেখে জ্বলে উঠি, শয়তান মানুষকে কত রকমেই না প্রতারণা করে। কে তার মুখ মানুষের মুখে দেখতে সাহস পায়?

মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, শঠ, হৃদয়হীনের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। পরশ্রীকাতর, অপ্রেমিক, মোনাফেকের মুখে আমি দেখেছি শয়তানের মুখ। জগতের সব ধন-সম্পদের বিনিময়ে শয়তানের মুখের সঙ্গে আমার মুখ বদলাতে চাইনে। সৌরভ, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত সৌন্দর্যের সাধ্য নেই শয়তানের কুৎসিত মুখচ্ছবি ঢাকে। যে তা দেখেছে, সে-ই ভয় পেয়েছে।

দৈনন্দিন জীবন

জীবনের প্রতিদিন আমরা কত মিথ্যাই না করি, সে জন্য আমাদের অন্তর-মানুষ লজ্জিত হয় না। আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করি, কিন্তু সে কালাম আমাদের প্রতারণা, মিথ্যা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করে না।